প্রথম অধ্যায়

দাম্পত্য-সমস্যার স্বরূপ ও মনস্তত্ত্ব সম্পর্কীয় তত্ত্ব ব্যাখান

সামাজিক নিয়ম মেনে দুই'জন অনাত্মীয় নারী-পুরুষ অনেক আশা, অনেক স্বপ্ন ও হৃদয়ভরা আবেগ নিয়ে দাম্পত্য সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ হয়। কিন্তু দেখা যায় নরনারীর ঐ সম্পর্ক কখনো তাদের জীবনকে সুখ-সমৃদ্ধিতে ভরিয়ে তোলে, তাদের বাঁধে অকৃত্রিম বন্ধুত্বের বন্ধনে, কখনো বা ঐ সম্পর্কের বন্ধন জীবনকে করে তোলে দুর্বিষহ। দাম্পত্য সম্পর্ক নষ্ট-দাম্পত্যে পরিণত হওয়ার কারণ হিসেবে বিবাহিত নারী পুরুষের কোনো একজনের জীবনে তৃতীয় কোনো ব্যক্তির উপস্থিতিকেই আমরা বড় করে দেখি। কিন্তু এই একটি কারণ ছাড়াও রয়েছে আরও শত-সহস্র কারণ, যা সম্পর্কের মাধুর্য নষ্ট করে। বাল্য বিবাহ, বয়সগত ব্যবধান, রুচিবোধের পার্থক্য, নারীর অন্ধ কুসংস্কার, আত্মপ্রতিষ্ঠার অভাব, বহুবল্লভতার কামনা, পুরুষতন্ত্রের জবরদস্তি, স্বামী-স্ত্রীর কোনো একজনের অমানবিক নিষ্ঠুর ব্যবহার, অসংকোচ লালসা, প্রভুত্ব-প্রিয়তা, বাস্তবতা বোধের অভাব হীনমন্যতা বোধ প্রভৃতি সমাজতাত্ত্বিক ও মনস্তাত্ত্বিক কারণগুলি নর- নারীর সম্পর্ককে কণ্টকাকীর্ণ করে তোলার ক্ষেত্রে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

পাত্র-পাত্রীর শিক্ষা-সংস্কৃতি ও রুচিগত বৈষম্য যেমন সম্পর্ককে বিষিয়ে তোলে, তেমনি স্বভাব-প্রকৃতির মিল হলে সম্পর্ক স্নিগ্ধ মাধুর্যে ভরে ওঠে। সুখী দাম্পত্য-জীবন পারস্পরিক ছন্দ-মিল, একটু সহানুভূতি, একটু সহমর্মিতা এবং কিছুটা যত্ন, ধৈর্য প্রত্যাশা করে। প্রত্যাশা পূরণ না হলে স্বামী-স্ত্রী একই ছাদের নীচে বসবাস করলেও প্রেমহীন জীবন-যাপন করতে বাধ্য হয়। তাদের মনোবীণার তারে ভাঙনের গান তীব্র থেকে তীব্রতর সুরে ঝঙ্কৃত হয়ে ওঠে। তখন মানব-মানবীর পরস্পরকে নিয়ে গড়ে তোলা স্বপ্নের অমরাবতী একটু ঝোড়ো হাওয়াতেই মাটিতে গড়াগড়ি খায়। স্বামী-স্ত্রী উভয়েই, কখনো বা কোনো একজন নীরব রক্তক্ষরণে নিরূপায় ভাবে ক্ষয়িত হয়। অপচয় ঘটে জাতীয় মানব সম্পদের। গান শেষ হয়, তবে গানের রেশ থেকে যায়। অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মানসিক দূরত্ব সৃষ্টি হলে তারা একই পরিবারে থেকেও

স্বতন্ত্র জীবন যাপন করতে পারে। আবার আজ একবিংশ শতাব্দীতে নারীর আত্মপ্রতিষ্ঠার যুগে বিবাহ-বিচ্ছেদের মাধ্যমে সম্পূর্ণ আলাদা জীবন যাপনের অধিকার স্বামী-স্ত্রী উভয়েরই আছে। তবে প্রশ্ন হল — যে সব স্বামী-স্ত্রী সন্তানের পিতা-মাতা,তাদের সম্পর্ক অনিশ্চিত বা দ্বিধাগ্রস্ত হলে শিশুরা কী বিপন্নতার শিকার হয় না ? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে যে কোনো সচেতন ব্যক্তিই হয়তো বলবেন, পিতা-মাতার মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাস ও শ্রদ্ধাবোধ না থাকলে শিশুরা নিজেদেরকে অসহায়, নিঃসঙ্গ ও বিপন্ন বলে মনে করে। এর কারণ হল —"শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথে বংশগতি কাঁচামাল জোগায়, কৃষ্টি নকসা জোগায় এবং পিতামাতা কারিগর হিসেবে কাজ করে থাকে। শিশুরা তাদের দাবী দাওয়া পূরণের ব্যাপারে তাদের পিতামাতার উপর নির্ভরশীল। তার ফলে শিশুরা বইয়ের কী জানবে ও কী শিখবে এ ব্যাপারে পিতা-মাতার একটা একচেটিয়া অধিকার পরিলক্ষিত হয়। বস্তুত শিশুরা কোন্ মূল্যবোধ গ্রহণ করবে বা কোন্ কৃষ্টি অনুসরণ করবে এ ঠিক করার ব্যাপারে পিতা-মাতার হাতই বেশি।"[১]

— এই জন্য দাম্পত্যের দ্বান্দ্বিক সম্পর্ককে প্রতিটি সচেতন মানুষ আজ আর শুধুমাত্র দুজন নর-নারীর হৃদয় যন্ত্রণা বলে মনে করেন না। তারা জানেন পারস্পরিক প্রেম-ভালবাসা নির্ভর ঐ সম্পর্কের ফাটল গোটা সমাজ-রাষ্ট্রের ভিতই নড়বড়ে করে দিতে পারে। তাই আজ স্বতন্ত্র দু'জন নর-নারীর যে সামাজিক সম্পর্ক অর্থাৎ দাম্পত্য-সম্পর্ক, তা টিকিয়ে রাখার প্রয়োজন অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। আমরাও ভাঙন প্রতিরোধ করে দাম্পত্য-সম্পর্ককে সুন্দর ও সার্থক করে তোলার বিষয়ে প্রয়াসী। এই জন্য নির্দিষ্ট কিছু উপন্যাসের দাম্পত্যকে আমরা আমাদের আলোচনার কেন্দ্রীয় বিষয় হিসাবে রেখেছি। কারণ, মানুষের বাস্তব জীবনের শৈল্পিক রূপ-ই তো উপন্যাস। তাই উপন্যাসে বর্ণিত স্বামী-স্ত্রীর দ্বন্দ্ব-জটিল মনের বিশ্লেষণ করে দাম্পত্য জীবনের-সমস্যা-সংকটের কারণ আমরা অনুসন্ধান করবো। এ ক্ষেত্রে সাহায্য নিতে হবে মনস্তত্ত্বের। তাই বর্তমান অধ্যায়ে থাকবে মনস্তত্ত্ব ও তার পারিভাষিক শব্দাবলী সম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক অলোচনা।

উনিশ শতকে জার্মান মনস্তত্ত্ববিদ গুস্তাভ ফেকনার (১৮০৩ -১৮৮৭) মনস্তত্ত্বকে বিজ্ঞানরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীতে মনস্তত্ত্বের প্রচার বা প্রসার তেমন ছিল না, বিংশ শতকের সূচনায় মনোবিজ্ঞানী সিগ্‌মন্ড ফ্রয়েডের (Sigmund Freud) 'The Interpretation of Dreams' (১৯০০খ্রিঃ) ও 'Psycho-pathology of Everyday life' (১৯০৪ খ্রিঃ) প্রকাশিত হলে শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীদের চিন্তাজগতে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি হয়। তাঁরা মানব মনের গোপন রাজ্য সম্পর্কে আগ্রহী হন। এরপর আমরা দেখি, ফ্রয়েডীয় চিন্তাধারার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে ঔপন্যাসিকেরা তাঁদের উপন্যাসে পাত্র-পাত্রীর গহন-মনের গভীর রাজ্যের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বর্ণনায় উৎসাহিত হয়ে ওঠেন। এর ফলে উপন্যাস মানব স্বীকৃতি থেকে বিবর্তিত হয়ে মানব-মনের স্বীকৃতির স্তরে পৌঁছায়। প্রাধান্য পায় মানুষের গোপন মন অর্থাৎ নির্জ্ঞান মনের বিশ্লেষণ বর্ণনা। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, 'মনস্তত্ত্ব' বিজ্ঞান হিসেবে প্রতিষ্ঠার পূর্বে বা ফ্রয়েডীয় তত্ত্ব আবিষ্কারের আগে নির্জ্ঞান বা অচেতন মন সম্বন্ধে মানুষের কোনো ধারণাই ছিল না, এমনটি নয়। ফ্রয়েডীয় তত্ত্ব বঙ্কিমচন্দ্রের সময়ের নয়, সুতরাং ফ্রয়েড মানব মনের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন সেই ব্যাখ্যাকে সামনে রেখে কিছু সৃষ্টি করেন নি। তাই বঙ্কিম সাহিত্যে আমরা মনের নির্জ্ঞান প্রদেশের কথা অন্যভাবে ব্যক্ত হতে দেখি। আমাদের সংস্কৃত সাহিত্যেও মনের চেতন স্তর ছাড়া অন্য স্তরগুলিরও ইঙ্গিত রয়েছে।

মহাকবি কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' নাটকের চতুর্থ অঙ্কে আমরা দেখি, শকুন্তলা কুটীরে উপস্থিত, কিন্তু সেখানে অতিথি দুর্বাসা উপস্থিত হলে তিনি তাঁকে উপযুক্ত সম্বর্ধনা জানাননি। এর কারণ কী? কারণ উল্লেখ করতে গিয়ে শকুন্তলার সখী প্রিয়ংবদা অনুসূয়াকে বলেছে — " প্রিয়ংবদাঃ ননু উটজে সন্নিহিতা শকুন্তলা। (আত্মগতম্) আম্ , অদ্য পুনঃ হৃদয়েন অসন্নিহিতা ।" অর্থাৎ 'কুটীরের কাছেই শকুন্তলা আছে। (স্বগতঃ) কিন্তু মন তো তার নিজের মধ্যে নেই ।' — প্রিয়ংবদার এই উক্তিটিতে আজ একবিংশ শতাব্দীতে আমাদের মানসপটে শকুন্তলার অবচেতন বা প্রাক্ চেতন মনের (Pre-Conscious mind- এর) কথাই ভেসে ওঠে, যেখানে সদ্য বিগত চিন্তাভাবনা, স্মৃতি ও নিরুদ্ধ আবেগ সঞ্চিত থাকে। প্রিয়ংবদা ঐ অবচেতন

মনের কথাই বলেছিল। শুধু তাই নয়, শকুন্তলা 'দিবা স্বপ্নে' মগ্ন থাকার জন্যই (রাজা দুষ্মন্তকে কেন্দ্র করে) যে, কুটীরে ঋষি দুর্বাসার উপস্থিতি টের পান নি— একথাও আমরা বলতে পারি।

এই নাটকেরই পঞ্চম অঙ্কে দেখা যায়, রানী হংসপদিকার গান শুনে রাজা অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন এবং তার কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে বললেন —

"রাজা ঃ- (আত্মগতম্) কিং ন খলু গীতার্থমাকর্ণ ইষ্টজন
বিরহাদৃতেহপি বলবদুৎ কণ্ঠিতোহস্মি।

অথবা —

রম্যানি বীক্ষা মধুরাংশ্চ নিশম্য শব্দান্
পর্যুৎসুকীভবতি যৎ সুখিতোহপি জন্তুঃ।
তচ্চেতসা স্মরতি নূনমবোধপূর্বং
ভাবস্থিরাণি জুননান্তর -সৌহৃদানি।"

অর্থাৎ "রাজা ঃ (স্বগতঃ) কোন ইষ্টজনের সঙ্গে আমার বিচ্ছেদ ঘটে নাই, তথাপি এই গান শুনিয়া আমি অত্যন্ত উৎকন্ঠিত হইয়াছি।" অথবা — "সর্বপ্রকারে সুখী হইয়াও কোন সুন্দর বস্তু দেখিয়া বা মধুর শব্দ শুনিয়া মানুষ কেন আকুল হয়? কারণ তাহার মনের মধ্যে বদ্ধমূল কোন জন্মান্তরীণ স্মৃতি অজ্ঞাতসারে তাহার মনে জাগিয়া উঠে।"[২]

এখানে 'বদ্ধমূল জন্মান্তরীণ স্মৃতি' মানুষের চেতনায় বা চেতন মনে থাকা কোনো স্মৃতির ইঙ্গিত করছে না ; তা মনের নির্জ্ঞান প্রদেশের সুপ্ত স্মৃতি ও চিন্তা ভাবনার ইঙ্গিত বহন করছে। শুধু কালিদাসের সাহিত্যেই নয়, একটু অনুসন্ধান করলে ফ্রয়েড পূর্ববর্তী যুগের আরো অনেক সাহিত্য ও ধর্মশাস্ত্রের মধ্যেও চেতনোর্ধ্ব মন সম্পর্কে মানুষের অস্পষ্ট ধারণার পরিচয় পাওয়া যাবে। এই প্রসঙ্গে 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা'র 'কর্মযোগ' নামক তৃতীয় অধ্যায়ের ৩৬ নং শ্লোকের উল্লেখ করা যেতে পারে। এই শ্লোকে অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বলেছেন —

"অথ কেন প্রযুক্তোহয়ং পাপং চরতি পূরুষঃ।
অনিচ্ছন্নপি বার্ষ্ণেয় বলাদিব নিয়োজিত ঃ।।"

অর্থাৎ ''হে কৃষ্ণ, তা হলে মানুষ স্বেচ্ছায় না করলেও যেন বলপূর্বক কার দ্বারা নিয়োজিত হয়ে পাপাচরণ করে?''[৩]

— এখানে বলা হচ্ছে, স্বেচ্ছায় অর্থাৎ চেতন মনের ইচ্ছায় পাপাচরণ করতে না চাইলেও মানুষ কখনো কখনো তা করতে বাধ্য হয়। — এই বাধ্যবাধকতার মধ্যেই আমরা চেতন মনের নিয়ন্ত্রক অন্য কোনো মনের ইঙ্গিত পেয়ে যাই। সেই মন অচেতন মন যা অদৃশ্যে থেকেই ব্যক্তির সচেতন আচরণকে প্রভাবিত করে। মনের এই স্তরটি সম্বন্ধে প্রাচীন ও মধ্যযুগের মানুষের কোনো তাত্ত্বিক ধারণা না থাকায় তাঁরা নিজেদের অজ্ঞাতেই আকারে ইঙ্গিতে ঐ চেতনোর্ধ্ব মনোরাজ্যের আভাস দিয়েছেন।

ফ্রয়েড মানব-মন সম্পর্কে সুদীর্ঘ গবেষণা করার পর জানান যে, মানুষ তার উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া আদিম যৌন কামনা-বাসনা ও জিঘাংসার অবদমন (repression) আর উত্তরোত্তর উদ্‌বর্তন (Sublimation) ঘটিয়ে মানব সভ্যতার প্রগতির রথকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছে, বিকাশ ঘটেছে শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির। কিন্তু কামনা-বাসনাকে অবদমিত (repressed) করার একটা মূল্য মানুষকে দিতে হয়েছে। অবদমিত কামনা-বাসনা স্বপ্ন-দৃশ্য হয়ে ব্যক্তির জীবনে ফিরে এসেছে। কখনো কখনো স্বপ্নই হয়ে উঠেছে মানুষের স্নায়ুরোগের উপসর্গ। তাই স্নায়ুরোগের স্বরূপ জানার জন্য 'স্বপ্নতত্ত্ব' সম্পর্কে ধারণা থাকা প্রয়োজন। আবার নির্জ্ঞান মন বা অবদমন ইত্যাদি সম্পর্কে সম্যক ধারণা না থাকলে স্বপ্নতত্ত্ব বা মানুষের বিভিন্ন ধরনের অসঙ্গতিপূর্ণ আচরণের স্বরূপ উপলব্ধি করা অসম্ভব। ফ্রয়েডের মতে — ''রোগলক্ষণ, স্বপ্ন, ঠাট্টা-তামাশা, ভুলে যাওয়া প্রভৃতি কোন মানসিক ঘটনাই আকস্মিক নয়। প্রত্যেকটি মানসিক ঘটনার পেছনে মানসিক কারণ বিদ্যমান রয়েছে যা ঐসব ঘটনার জন্ম দেয়। অর্থাৎ আপাতদৃষ্টিতে কোন মানসিক ঘটনার মানসিক কারণ সংজ্ঞানে খুঁজে পাওয়া না গেলে, তাকে — আকস্মিক বলে ধরা ঠিক নয়। কারণ যদি সংজ্ঞান মনে না থাকে, তাহলে নির্জ্ঞান মনে আছে, বর্তমান বয়সের ঘটনাবলীর মধ্যে খুঁজে পাওয়া না গেলে শৈশবের ঘটনার মধ্যে রয়েছে। পার্থক্য শুধু এই যে

মনঃসমীক্ষণের সাহায্যে শৈশবের অবদমিত ইচ্ছা, কামনা-বাসনা খুঁজে বের করে আনলে, তবেই ঐ কারণের সন্ধান পাওয়া যাবে।''[৪]

আমাদের আলোচ্য 'মনস্তত্ত্বের আলোকে বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের বাংলা উপন্যাসে দাম্পত্য সমস্যা'। অর্থাৎ ঐ ত্রয়ী ঔপন্যাসিকের উপন্যাসে বর্ণিত দম্পতিদের সমস্যা সৃষ্টির মূলে যে সব মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা ক্রিয়াশীল, সে দিকটি উদঘাটন করা। দাম্পত্য-সমস্যার কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে মনস্তত্ত্বের যে পরিভাষাগুলির ব্যবহার করা হবে আলোচ্য অধ্যায়ে সে বিষয়ে আমরা প্রাসঙ্গিক অলোচনা করব। (এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, ঐ তিনজন ঔপন্যাসিকের প্রত্যেকেই যে ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্বের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পাত্র-পাত্রীর মনের চিত্র-অঙ্কন করেছেনএমনটি নয়। রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র ফ্রয়েডের চিন্তা-ভাবনার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন ঠিকই, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস প্রকাশিত হবার অনেক পরে ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্ব প্রচার ও প্রসার লাভ করে। তাই একথা বলতেই হয়, মনস্তত্ত্বের আবিষ্কারের পূর্বেই বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গির নিরিখেই উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীদের মানস জগতের দ্বন্দ্ব-বিক্ষোভকে সুমতি-কুমতির দ্বন্দ্বের মাধ্যমে ব্যক্ত করেছেন। তাই পাত্র -পাত্রীর নিজ্ঞান প্রদেশের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় যে মনে সচেতনতার পরিচয় ফুটে উঠেছে, সেই দিকটিও আমরা মনস্তত্ত্বের আলোকে ব্যাখা বিশ্লেষণ করবো।)

প্রাচীন ও মধ্যযুগের কিছু সাহিত্যে চেতন অবচেতন নিজ্ঞান মনের ইঙ্গিত থাকলেও মন বলতে শুধুমাত্র মনের উপরিস্তর (Surface mind) - কেই বোঝানো হত ; মনের এই চেতন অংশটি বাস্তব জগতের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। এই অংশেই মানুষের সুখ-দুঃখের — চিন্তা, অনুভূতি, আবেগ ও ইচ্ছার বহুবিধ রূপের পরিচয় পাওয়া যায়।চেতন মনের দ্বারাই আমরা জগৎকে জানি এবং দেখি। বাইরের জগৎ-এর বিভিন্ন উদ্দীপক দ্বারা আমরা যেমন প্রভাবিত হই, তেমনি চেতন মনের দ্বারাই বাইরের জগৎ এর উপর প্রভাব বিস্তার করি। ফ্রয়েড (১৮৫৬-১৯৩৯) ঘোষণা করেন— মনের চেতন অংশটি মনের খন্ডাংশ মাত্র ; চেতন স্তরের মাধ্যমে মনের সমগ্র রূপের

পরিচয় জানা যায় না। মনঃ সমীক্ষণ পদ্ধতির সাহায্যে তিনি বোঝালেন, চেতন স্তর (Conscious level) ছাড়া মনের আরো দুটি স্তর রয়েছে — প্রাক্‌চেতন বা অবচেতন অংশ (Sub-conscious or pre- conscious level) এবং অচেতন অংশ বা নির্জ্ঞান মন(Unconscious level) । মনকে জলে ভাসমান তুষার স্তূপের সঙ্গে তুলনা করা যায়। ভাসমান তুষার স্তূপের খুব কম অংশই সাগর জলের ওপরে থাকে, যা আমরা দেখতে পাই ; বাকি অংশ থাকে জলের নীচে। তেমনি আমাদের মনের অতি অল্প অংশই সংজ্ঞান বা চেতন, বাকি অংশ নির্জ্ঞান বা অচেতন।

অচেতন বা নির্জ্ঞান মন (Unconscious mind) - এর অস্তিত্ব স্বীকার না করলে বিভিন্ন ধরনের মানসিক রোগের (যেমন - হিস্ট্রিরিয়া, শুচিবায়ু রোগ, বাতুলতা, হীনমন্যতা) বা ব্যক্তির আচার-আচরণের অসঙ্গতির যথার্থ কারণ ব্যাখ্যা করা যায় না। ফ্রয়েড তাঁর "Psycho-Pathology of Everyday life " গ্রন্থে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের ছোটো খাটো অনেক ভুল -ভ্রান্তির ব্যাখ্যা করে মনের নির্জ্ঞান স্তর (Unconscious level) -এর অস্তিত্বের যুক্তি দিয়েছেন।

আমাদের আকস্মিক ভাবে কিছু মনে পড়ে যাওয়া, অগোচর আবেগ, নিদ্রাকালীন মনের ক্রিয়া অদ্ভূত, উদ্ভট বা অর্থহীন স্বপ্ন প্রভৃতি বিষয়গুলি অবচেতন ও নির্জ্ঞান মনের অস্তিত্বকেই প্রমাণ করে। উদ্‌গতি (Sublimation),অভিক্রান্তি (Displacement), পশ্চাদ্‌গমন বা প্রত্যাবৃত্তি (Regression) ইত্যাদিকে ফ্রয়েড নির্জ্ঞান ইচ্ছা প্রকাশের উপায় বলে মনে করেন।

অচেতন বা নির্জ্ঞান স্তর (unconscious level) মনের নিষ্ক্রিয় কোনো অংশ নয়। বরং মনের এই তৃতীয় স্তরটিই অত্যন্ত সক্রিয়। 'অচেতন' শব্দটি এখানে 'চেতনাবিহীন' অর্থে ব্যবহার করা হয়নি। ফ্রয়েডীয় মনঃ সমীক্ষা সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গিতে 'unconscious' বা 'অচেতন' কথাটির স্বতন্ত্র একটি অর্থ আছে। চেতন স্তর বহির্ভূত অথচ মনের অন্তর্গত গভীরতম গতিশীল স্তরটিকেই ফ্রয়েড 'নির্জ্ঞান' বলে অভিহিত

করেছেন। তাঁর মতে নির্জ্ঞান মন অবদমিত কামনা-বাসনার আশ্রয়স্থল। আমাদের অবদমিত বাসনাগুলি মনের নির্জ্ঞান প্রদেশে নির্বাসিত হয়। তবে সেখানে গিয়ে তারা নিষ্ক্রিয় থাকে না, সর্বদাই আত্মপ্রকাশের চেষ্টা করে। কিন্তু মানুষের জাগ্রত অবস্থায় অসামাজিক কামজ ইচ্ছাগুলি স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করতে পারে না। কারণ জাগ্রতকালে ন্যায়-নীতি-পুষ্ট অধিশাস্তা বা Super-ego সর্বদা প্রহরীর মত সজাগ থাকে। তাই নির্জ্ঞানের অবদমিত ইচ্ছাগুলি জাগ্রত অবস্থায় পরোক্ষভাবে দৈনন্দিন জীবনের ভুল-ত্রুটি দিবা-স্বপ্নের মধ্য দিয়ে, কখনো বা মানসিক রোগের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। অবদমিত ইচ্ছার ঐ প্রকাশগুলি সর্বদাই ছদ্মবেশ ধারণ করে আত্মপ্রকাশ করে। তাই তাদের ছদ্ম আবরণ উন্মোচন না করে নির্জ্ঞান ইচ্ছার স্বরূপ জানা যায় না। মনঃসমীক্ষণের দ্বারা নির্জ্ঞান-ইচ্ছার অব্যক্ত রূপের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করা যায়। নির্জ্ঞান কোনো যুক্তি বুদ্ধি বা ন্যায় নীতি বোধের ধার ধারে না। নিজের দাবী পূরণ করাই তার একমাত্র লক্ষ্য। ফ্রয়েডের মতে নির্জ্ঞান মানসবৃত্তির উৎস দুটি — কিছু মানসবৃত্তি জন্মসূত্রে প্রাপ্ত, কিছু মানসবৃত্তি ইচ্ছার অবদমন জনিত। নিষ্পাপ শিশু — যারা জটিল জগতের কিছুই জানে না, বোঝে না, তাদের মনেও কামনা পুঞ্জীভূত থাকে। শিশুরা স্বার্থপর, আত্মসুখ পরায়ণ। তারা নিজের সুখের জন্য, মনের নিত্য নতুন সাধ মেটাবার জন্য ভালো মন্দ সব ধরনের কর্মের জন্য প্রস্তুত। পিতা-মাতা, ভাই-বোন সকলকেই সে তার প্রীতি বা সুখ উৎপাদনের যন্ত্র বলে মনে করে। সুখের ব্যাঘাত ঘটলেই সে ক্রুদ্ধ হয়। জীবনের প্রথমে তাদের ন্যায়-অন্যায় বোধ থাকে না বলে নিজ সুখের জন্য এমন অনেক কিছু সে কামনা করে যা ন্যায় সঙ্গত নয়। কিন্তু একটু একটু করে বড়ো হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে উপলব্ধি করতে পারে বড়রা তার অনেক কামনা বাসনা পছন্দ করছে না, কিছু কিছু কামনা বাসনা পূরণের জন্য তাকে শাস্তি পেতে হচ্ছে, শাস্তির ভয়ে শিশুর মনে অবদমন প্রক্রিয়া শুরু হয়। পিতা-মাতা, শিক্ষক, পরিবার, সমাজ প্রভৃতি শাসকদের নৈতিক মানদন্ডে শিশুর যে ইচ্ছাগুলি প্রত্যাখ্যাত হয়, সে সেগুলি অবদমন করে। আর তার ঐ অবদমিত কামনা বাসনাগুলি তখন মনের সচেতন স্তর থেকে বহিষ্কৃত হয়ে নির্জ্ঞানে আশ্রয় নেয়—"শিক্ষা শাসন প্রভৃতির ফলে শিশুর সহজাত কামপ্রবৃত্তি অনেকটা নিয়ন্ত্রিত হয় এবং বড় হইবার সঙ্গে সঙ্গে তৎসংক্রান্ত অসামাজিক ভাবগুলি মনের গভীর স্তরে চলিয়া যায়। শিশুর অসামাজিক

কামবৃত্তিগুলি কখনোই একেবারে নষ্ট হয় না ; নির্বাসিত হইয়া রুদ্ধাবস্থায় তাহারা অজ্ঞাত মনে থাকিয়া যায়। এই রুদ্ধ প্রবৃত্তি হইতেই পরবর্তীকালে মানসিক রোগের উৎপত্তি হইয়া থাকে।''[৫]

জৈবিক প্রবৃত্তি, অবদমিত অসামাজিক নগ্ন কামনা-বাসনা ও প্রক্ষোভ প্রভৃতি মনের অচেতন বা নির্জ্ঞান (Unconscious) প্রদেশের অধিবাসী —একথা আজ মনোবিজ্ঞানীদের সঙ্গে শিল্পী, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবিরাও স্বীকার করে নিয়েছেন। ফ্রয়েড বলেছিলেন যে, সহজাত কামনা-বাসনাগুলি জন্ম থেকেই অচেতনের অধিবাসী। তারা সরাসরি চেতন স্তরে উঠে আসে না ঠিকই, তবে অচেতনে থেকেই সচেতন আচরণকে প্রভাবিত করে। ফ্রয়েড অচেতন ও চেতন মনের নাম পরবর্তীকালে পরিবর্তন করে অদস্ বা ইদ্ (id) এবং অহম্ বা ইগো (ego) রেখেছিলেন।

ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্বে ইদ্ (id) বা নির্জ্ঞান মন হল, মানুষের আদিম যুগের যুক্তিহীন, দুর্জ্ঞেয়, অপ্রতিরোধ্য সহজাত প্রবৃত্তি। ইদ্ (id) অন্ধ প্রবৃত্তির তাড়নায় অবরুদ্ধ কামজ ইচ্ছাগুলিকে চেতন বা সংজ্ঞানে পাঠাতে চায়। ইদ্ (id) অন্ধকার জগতের বাসিন্দা, বাহ্যপরিবেশের সঙ্গে যোগাযোগ না থাকায় তার কোন বাস্তববোধ (reality sense) থাকে না, সে পরিচালিত হয় সুখনীতি বা সুখসূত্রের (Pleasure Principle) দ্বারা। ইদ্ সব সময় চায়, জৈবিক চাহিদার তাৎক্ষণিক পূরণ। বৈধ-অবৈধ, সময়-অসময় বিবেচনা ইদ্ বা অদসের জন্য নয়। ইদ্ বা অদস বন্য, বর্বর, বিশৃঙ্খল সব ধরনের নিয়মকানুনের বিরোধী, প্রবৃত্তির সেবাদাস।

সাধারণভাবে আমরা যাকে অহং বা চৈতন্য বলি ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্বে তাকেই বলা হয় ইগো (ego) বা চেতন মন (Consciousmind)। জন্মগ্রহণের পর প্রতিটি শিশুই হচ্ছে কতকগুলো সহজাত প্রবৃত্তির (Instincts) আধার। সে তখন ইদ্ বা অদসের দ্বারা পরিচালিত হয়। এরপর একটু একটু করে বড় হবার সাথে সাথে শিশুর অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র বেড়ে যায়। সে বুঝতে পারে কখন কোন্ প্রবৃত্তির দাবী মেটানো উচিৎ। বাবা-মা, শিক্ষক-শিক্ষিকা, পরিবার, সমাজের দৃষ্টিতে কোন ধরনের প্রবৃত্তির

দাবী চরিতার্থ করতে চাওয়া অন্যায়। এরপর সে সময় ও পারিপার্শ্বিকতা সম্পর্কে সজাগ হয় এবং তার গড়ে ওঠা মূল্যবোধ ও প্রতিকূল পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে জৈবিক ইচ্ছাগুলি পূরণ করতে চায়। প্রতিকূল অবস্থায় সে তার জৈবিক চাহিদা পূরণ বিলম্বিত করে, কখনো আবার তার ইচ্ছাকে অবদমিত করে। শিশু বা ব্যক্তির এই ধরনের বাস্তব সত্তাই হচ্ছে ইগো (ego) বা অহম্। অর্থাৎ ইগো বা অহম্ যে ধর্ম মেনে চলে তা হল বাস্তব নীতি (reality principle)। ইগো সহজাত প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণ করতে চায়, কিন্তু ভালো-মন্দ ইত্যাদি বিষয়ে তার দৃষ্টি সজাগ — ঐ গুলির বিচার বিবেচনা করেই সে তার প্রবৃত্তি চরিতার্থ করবে।

ইদ্, ইগোর আলোচনা প্রসঙ্গে এসে পড়ে সুপার ইগো (Super-ego বা অধিশাস্তার কথা। ফ্রয়েড সুপার ইগোকে 'Censorial guardian' বা 'অভিভাবক প্রহরী' বলে মনে করেন। সুপার ইগো বা অতি অহম্ - এর ধর্ম হল 'আদর্শ'— যা কিছু মহৎ বা নৈতিকতাপূর্ণ তাই করণীয়, অনৈতিক কর্ম সর্বদা পরিত্যাজ্য। এই জন্য সুপার ইগোকে ব্যক্তিত্বের নৈতিক হাতিয়ার (Moral arm of personality) বা 'অনমনীয় বিবেক' (uncompromising conscience) বলা হয়। সুপার ইগোর কাজ হল, " ইদ্ বা অদসের অন্ধ কিন্তু দুর্বার সহজ প্রবৃত্তিগুলিকে শাসন করা এবং অহম্ যদি কখনো ইদ্-এর দাবীকে মান্য করে নিরুদ্ধ ইচ্ছাকে চেতনায় স্থান দেয় তাহলে অহংকে কঠোর শাস্তি দেওয়া। কোন্ যৌনতৃষ্ণাটি (ব্যাপক অর্থে) চরিতার্থ করা যাবে, অহং-এর কোন্ দাবিটি বাস্তব পরিবেশ অনুসারে অনুমোদন যোগ্য হবে — এই সবই নির্ধারণ করে অধিশাস্তা বা বিবেক।"[৬]

স্বপ্নতত্ত্ব ঃ ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্বের বিভিন্ন তত্ত্বাবলীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হল স্বপ্ন। স্বপ্ন সম্পর্কে ফ্রয়েডের তত্ত্ব প্রকাশিত হবার পূর্বে 'স্বপ্ন' বলতে সাধারণ মানুষ দৈবাদেশ বা ভাবী মঙ্গল অমঙ্গলের ইঙ্গিতকেই বুঝতো। অনেকে মনে করত স্বপ্নে আত্মা দেহের বাইরে এসে বিচরণ করে। ফ্রয়েড স্বপ্ন নিয়ে দীর্ঘ অনুসন্ধান ও গবেষণার পর জানান যে, স্বপ্ন হল আমাদের অপূর্ণ ইচ্ছা ও বাসনার পরিপূরণ, মানুষের অচেতন বা নির্জ্ঞান মনের গোপন চিন্তাভাবনা স্বপ্নের মাধ্যমে চেতন মনে এসে পূর্ণতালাভের চেষ্টা করে। তিনি আরও বলেন যে, নির্জ্ঞান মনের কোন অপূর্ণ ইচ্ছাই অবিকৃতভাবে স্বপ্নের মধ্য

IBRARY
NBU, DARJEELING
271075
07 JUN 2014

দিয়ে আত্মপ্রকাশ করতে পারে না। যে সব অনৈতিক, অসামাজিক কামনা-বাসনা সমাজ শাসনের ভয়ে অবদমিত হয়, সেগুলিই সেন্সর (Censor) বা প্রহরীর সতর্ক দৃষ্টি এড়াবার জন্য ছদ্মরূপে আত্মপ্রকাশ করে। চেতন রাজ্যে স্বপ্নের প্রকাশিত রূপকে ফ্রয়েড নাম দিয়েছেন 'Manifest dream content' বা স্বপ্নের প্রকাশিত রূপ। স্বপ্নের অন্তর্নিহিত রূপ হল নির্জ্ঞান মনের অবদমিত কামনা-বাসনা ; ফ্রয়েড এই রূপের নাম দিয়েছেন 'Latent dream Content'। তিনি 'The Interpretation of Dreams' (১৯০০ খ্রিঃ) গ্রন্থে স্বপ্নের বিচিত্র ছদ্মবেশ বা সঙ্কেতের ব্যাখ্যা করেছেন। পাভলভের মতে স্বপ্ন হল, "এক ধরনের মননক্রিয়া, হ্যালুসিনেশানের সমগোত্র। ঘুমের মধ্যে আমরা একেবারে অচেতন হই না। মস্তিকের কিছু জায়গা স্বপ্নের মধ্যেও জেগে থাকে। জৈব প্রক্রিয়ার কেন্দ্রগুলি শুধু নয়, যে সব জায়গা দিনের কার্য উপলক্ষে খুব বেশি উত্তেজিত বা নিস্তেজিত হয়েছে, সেগুলো জেগে থাকতে পারে। এই সব কেন্দ্র ও কোষসমষ্টির উদ্দীপনার ফলে স্বপ্নদৃশ্যের অভিনয় ঘটে...।"[৭]

স্বপ্ন সম্পর্কে ফ্রয়েডের মতবাদ ছাড়া আর একটি মতবাদ হল শারীরবৃত্তীয় মতবাদ। তবে ফ্রয়েডের মতটিই অনেক বেশি বিজ্ঞান সম্মত এবং নিঃসন্দেহে যুগান্তকারী। ফ্রয়েড মনে করেন যে, স্বপ্ন বিশ্লেষণ করেই মানুষের নির্জ্ঞান রাজ্যের সঠিক পরিচয় পাওয়া যায়

ফ্রয়েডের 'Psycho-Pathology of Everyday life' গ্রন্থের সর্বরতিবাদ (Pansexuality) বা লিবিডো (Libido) সংক্রান্ত আলোচনা মানব আচরণের এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। এখানে ফ্রয়েড জীবনের মূল চালিকা শক্তি হিসেবে লিবিডো-র কথা বলেছেন। লিবিডোকে তিনি যৌনপ্রবৃত্তি মূলক শক্তি বলেছেন। যৌনপ্রবৃত্তির অর্থকরণে ভিন্নতাই ফ্রয়েডের মূল্যায়নকে জটিল করে তুলেছে। অনেকের কাছে 'লিবিডো' সংকীর্ণ অর্থে যৌনতা বা যৌনকর্ম, অনেকে আবার যৌনতা ছাড়াও যেকোনো সুখানুভূতিকেই 'লিবিডো' র আলোচনায় প্রাধান্য দিয়েছেন। আমরা দ্বিতীয় মতটি অর্থাৎ বৃহৎ অর্থ ধরেই 'লিবিডো' শব্দটির প্রাসঙ্গিক তাৎপর্য ব্যাখ্যা করবো।

লিবিডো (Libido) হল মানুষের যৌন প্রবৃত্তিমূলক সহজাত মানসশক্তি। ফ্রয়েড বলেছেন যে, এই লিবিডোর একমাত্র উদ্দেশ্য আত্মসুখ বা আত্মতৃপ্তি। লিবিডো যে শুধুমাত্র শৈশবের প্রেম-ভালবাসা ও যৌনতার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এমনটি নয়। মানুষের প্রভুত্ব প্রিয়তা, কর্তৃত্বের ইচ্ছা ও দাসত্বের মধ্যেও থাকে একধরণের যৌনতার (আত্মসুখ বা Pleasure Principle) প্রকাশ। লিবিডো মানুষের জীবনে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে আত্মতৃপ্তি লাভ করে। লিবিডোকে চারটি স্তরে বিভক্ত করা হয়েছে। এর মধ্যে 'তৃতীয় স্তরটি' আমাদের গবেষণা সন্দর্ভের বিষয়বস্তু আলোচনার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক। আমরা তৃতীয় স্তর বা উপস্থ স্তর (Phallic stage) সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করবো।

এই উপস্থ স্তরে পুত্র-কন্যা উভয়েই মাকে স্বাভাবিক ভাবে ভালোবাসে। ফ্রয়েড বলেছেন যে, সন্তানের মনে মায়ের প্রতি কামেচ্ছা জাগে। এখানে আমরা 'কামেচ্ছা' শব্দটি ব্যাপক অর্থে ধরব, আত্মসুখ পরায়ণতার ইচ্ছা। এই স্তরেরই (৩ থেকে ৬ বছর বয়স পর্যন্ত) প্রথম দিকে ছেলে-মেয়েদের দাবী-দাওয়া পূরণের ক্ষেত্রে মায়ের ভূমিকাই প্রধান থাকে। মাকে তারা মনে করে প্রীতি উৎপাদনের যন্ত্র। প্রাথমিক স্তরের পর (বয়স একটু বাড়লে) তাদের মানসিকতার পরিবর্ত্তন ঘটে। ফ্রয়েডের মতে এই সময় ছেলেদের মনে মায়ের প্রতি কামেচ্ছা জাগে। কিন্তু মা ছেলের কাছে শ্রদ্ধার পাত্রী। তাই সামাজিক অনুশাসনের ভয়ে তার মধ্যে জটিল দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। তারা খুব অসহায় বোধ করে। ছেলেদের এই জটিল অবস্থাকেই ইডিপাস গূঢ়ৈষা (Oedipus Complex) বলে। এই অবস্থার নামকরণে ফ্রয়েড গ্রীক পুরাণের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। গ্রীক পুরাণের হতভাগ্য রাজা ইডিপাস অদৃষ্টের পরিহাসে নিজের অজান্তেই বাবাকে হত্যা করে মাকে বিয়ে করেছিলেন। ফ্রয়েড হয়তো ব্যক্তির অসহায় করুণ মানসিক অবস্থা বোঝানোর জন্য ঐ ধরণের নামকরণ করেছেন।

আমরা দেখলাম, ছেলেদের অনুরাগ সৃষ্টি হয় মায়ের প্রতি। কিন্তু মেয়েদের ক্ষেত্রে এর বিপরীত ব্যাপারটিই ঘটে থাকে। তাদের অনুরাগ দেখা যায় বাবার প্রতি, কখনো বা দাদার প্রতি। বাবার প্রতি অনুরাগের সঞ্চার হলে তারা বাবার কাছ থেকে

স্নেহ-ভালবাসা পাওয়ার ক্ষেত্রে মাকে-ই প্রতিদ্বন্দ্বী বলে মনে করে। ফ্রয়েডের ভাষায় মেয়েদের এই অবস্থার নাম ইলেকট্রা গূঢ়ৈষা (Electra Complex)। শৈশবে বাবা অথবা দাদা —— এদের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে থাকার জন্য এবং তাদের আচরণকে আদর্শ স্বরূপ মনে করার ফলে মেয়েদের অজ্ঞাতেই আদিম যৌনপ্রবৃত্তিমূলক শক্তি বাবা বা দাদার প্রতি অনুরাগের সঞ্চার করে। এই সহজ সত্য আজ সর্বজন স্বীকৃত। শুধু তাই নয়, লিবিডো যদি কোন স্তরে অতৃপ্ত থাকে বা নিজেকে মানিয়ে নিতে না পারে তাহলে ব্যক্তির আচরণে নানা ধরণের অসঙ্গতি দেখা দিতে পারে —— একথাও আজ প্রমাণিত।

ফ্রয়েড এবং তাঁর অনুগামীরা মনে করেন যে, অধিকাংশ অস্বাভাবিক আচরণের মূলে থাকে কোনো অতৃপ্ত যৌন কামনা বৃহৎ অর্থে, শুধুমাত্র Sex নয়, যে কোনো সখানুভূতি। অবদমিত যৌন কামনার পরিতৃপ্তির প্রয়াসই মনোরোগের লক্ষণরূপে প্রকাশ পায়। সমাজ সভ্যতা বিরোধী যে সব ইচ্ছা বাস্তবে পূর্ণ হয় না, সেই ইচ্ছাগুলিই বিকল্প আচরণের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়, তাই ফ্রয়েড যে কোনো মনোব্যাধিকেই যৌনধর্মী বলে মনে করেছেন। তাঁর মতে শৈশবকালীন লিবিডোর সংবন্ধন (Fixation of libido) হল পরোক্ষ কারণ, আর যে আঘাত মূলক অভিজ্ঞতার জন্য লিবিডো বা যৌনমানসশক্তি শৈশবকালীন সংবন্ধনের ক্ষেত্রে প্রত্যাবর্তন করে, সেটি হল মানসিক রোগের প্রত্যক্ষ কারণ।

ফ্রয়েড নির্জ্ঞান মনকে (Unconscious mind) কেবলমাত্র অবদমিত (repressed) কামনা বাসনার রাজ্য বলেই মনে করেননি। তিনি জানিয়েছেন, নানা প্রকার উদ্দেশ্য বা প্রেষণাও নির্জ্ঞান মনে জন্মলাভ করে। তবে নির্জ্ঞানের কোনো কামনা-বাসনাই সচেতন মনে অবিকৃত ভাবে প্রকাশিত হতে পারে না। ঐ স্তরের প্রেষণাগুলিও স্বাভাবিক ভাবে প্রকাশিত না হয়ে বিকৃতভাবে আত্মপ্রকাশ করে —— "শিশুকাল থেকেই অর্থাৎ জন্মের পর থেকেই শিশুর যে চাহিদা বা বাসনা-কামনা থাকে তার একটা বিরাট অংশ অন্ততঃ শিশু বড় হবার পর সম্পর্ণ বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যায়। এই চাহিদা বা বাসনা-কামনার সমস্তই কোন না কোন যৌন চাহিদা। অর্থাৎ জন্মের পর থেকেই শিশুর যৌন চাহিদা থাকে। ঐ যৌন-চাহিদা সামাজিক

দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিচার করলে নোংরা ও অনৈতিক। তাই বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে আমরা সেই সব চাহিদাগুলিকে নিজের অজান্তেই নির্জ্ঞানে নির্বাসিত করি। এইভাবে যে চাহিদাগুলিকে আরা নির্বাসিত করেছি, সেই চাহিদাগুলিই অন্য রূপ নিয়ে অনেক সময় রোগলক্ষণের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। এর থেকে প্রমানিত হয় যে আমাদের চাহিদা নির্বাসিত করা মানে তাকে ধ্বংস করা নয়। প্রতিটি চাহিদার সঙ্গে কিছু মানসিক শক্তি (psychic energy) যুক্ত থাকে। যতক্ষণ সেই ক্রিয়াশক্তির (energy) কোন না কোন রূপে মুক্তিলাভ ঘটছে না, ততক্ষণ তা ক্রিয়াশীল থাকে এবং বিভিন্ন উপায়ে — যথা স্বপ্ন বা রোগলক্ষণের মাধ্যমে — মুক্তিলাভ করে। অবশ্য অবদমিত বাসনা-কামনার সুস্থ ও স্বাভাবিক মুক্তিলাভও সম্ভব যা রোগলক্ষণ উৎপন্ন করে না।"[৮]

"স্বপ্ন ছাড়াও ধর্ম, দর্শন, শিল্প, সাহিত্য প্রভৃতি মানব জীবনের উচ্চতর আদর্শ বা মূল্যগুলির এবং নানা রোগ লক্ষণ বা উপসর্গের মধ্য দিয়াও নির্জ্ঞান মনের ক্রিয়া প্রকাশিত হয়। স্বভাবী লোকের অবদমিত নির্জ্ঞান ইচ্ছা প্রধানতঃ তিনটি উপায়ে সংজ্ঞান মনে আত্মপ্রকাশ করে।"[৯] এই তিনটি উপায় হল- ১. উদ্‌গতি (Sublimation) ২. অভিক্রান্তি (Displacement), ৩. প্রতিক্রিয়া গঠন বা বিপরীত গঠন (Reaction Formation), এছাড়া আরও বিভিন্নরূপে নির্জ্ঞান উদ্দেশ্যের বিকৃত প্রকাশ ঘটতে পারে। প্রকাশের রূপগুলি হল — অভিক্ষেপ (Projection), ২. যুক্তসভাস (Rationalization), ৩. ক্ষতিপূরণ (Compensation) ৪. মনঃসৃষ্টি (Phantasy), ৫. প্রত্যাবৃত্তি (Regression) ইত্যাদি।

উদগতির (Sublimation) ফলে ব্যক্তির অবরুদ্ধ বা নিষিদ্ধ ইচ্ছা তার অসামাজিক লক্ষ হতে সরে এসে কোন কল্যাণমূলক কর্মের দিকে চালিত হয় এবং দেশ ও দশের মঙ্গলময় কর্মে নিয়োজিত হয়ে তৃপ্তি লাভ করে। উদ্‌গতির ফলেই শিল্প-সাহিত্য, ধর্ম-দর্শন, বিজ্ঞান সমাজ হিতৈষণা , দেশপ্রেম প্রভৃতি উচ্চতর আদর্শ গুলির বিকাশ ঘটে। আসল কথা, ব্যক্তির লিবিডো (Libido) যখন কোন ক্ষেত্রে অতৃপ্ত হয়, তখন সমাজ স্বীকৃত সম্মানজনক কোনো কাজের মাধ্যমে সে তৃপ্তি লাভের চেষ্টা করে। লিবিডোর তৃপ্তিলাভের এই ধরনের প্রয়াসকে ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্বের পরিভাষায়

Sublimation বলা হয়। উদ্‌গতি বা Sublimation সংজ্ঞান ইচ্ছার দ্বারা সাধিত হয় না। আমরা যখন কোনো মহিলাকে সেবাব্রতে আত্মোৎসর্গ করতে দেখি, তখন ধরে নিতে হবে, তাঁর অবদমিত মাতৃত্বের কামনাই তাকে ঐ কাজে উৎসাহিত করেছে।

নির্জ্ঞান ইচ্ছার অপর একটি প্রকাশ হল অভিক্রান্তি। এক্ষেত্রে অবদমিত ইচ্ছা উদগতির মতো কোনো কল্যাণকর পথে প্রবাহিত হয় না। এই পদ্ধতিতে এক উদ্দেশ্যের লক্ষ্যবস্তু অন্য কোন লক্ষবস্তুর দ্বারা প্রচ্ছন্ন হয়ে যায়। যেমন কোনো মহিলার অবদমিত মাতৃত্ব কামনা কুকুর, বিড়াল, পাখি পোষার মধ্য দিয়ে বিকৃত ভাবে প্রকাশিত হয়।

প্রতিক্রিয়া গঠন হল নির্জ্ঞান ইচ্ছা প্রকাশের এমন একটি উপায়, যেখানে মনের উদ্দেশ্য বিপরীত রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। তাই সমাজে এমন দৃষ্টান্ত দেখা যায় যে, কোনো সাধু হঠাৎ চোরে পরিণত হচ্ছে, আবার কোনো দুর্বৃত্ত রাতারাতি সাধুতে পরিণত হয়েছে।

বিকৃত ইচ্ছার প্রকাশ অভিক্ষেপ বা Projection এর মাধ্যমেও রূপায়িত হয়ে থাকে। " ব্যক্তির নিজের মনের গহনে লুকিয়ে থাকা এবং নিজের কাছে অবাঞ্ছিত ধারণা আকাঙ্ক্ষা গূঢ়ৈষা (Complex) প্রভৃতির চাপ থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য সেগুলি অপরের ঘাড়ে চালান করে দেওয়ার নির্জ্ঞান (Unconscious) প্রক্রিয়া"[১০] আমরা সমাজে তাই দেখতে পাই, যে সকল পুরুষ অন্য স্ত্রী লোকের প্রতি আসক্ত, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তারাই পতিব্রতা স্ত্রীর সতীত্ব সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করে থাকে।

যুক্ত্যাসভাস (Rationalization) হল এক ধরনের আত্মরক্ষার কৌশল, ভাবনাচিন্তা না করে হঠাৎ ক্রুদ্ধ হয়ে কোন কাজ করতে পারে ভেবে চিন্তে একটা উচ্চমার্গের যুক্তি খাড়া করার ঘটনা। বাবা হঠাৎ রেগে গিয়ে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে ছেলেকে মারলেন, পরে যুক্তি খাড়া করলেন তিনি ছেলের ভালোর জন্যই মেরেছেন। নির্জ্ঞান উদ্দেশ্যকে ছদ্ম আবরণে প্রকাশের একটি পন্থা বা উপায় হল ক্ষতিপূরণ বা অনুপূরণ। ব্যক্তি নিজের কোনো ত্রুটি বা দুর্বলতা ঢাকার জন্য এমন কোনো গুণ কিংবা

সমাজের চোখে প্রশংসার যোগ্য এমন কোনো কর্মদক্ষতাকে বাড়িয়ে প্রকাশ করতে চেষ্টা করে। এমন অনেক ছেলে মেয়ে আছে যারা নিজেদের নিজেরাই সুশ্রী বলে মনে করে না, তাই তাদের সৌন্দর্যের ক্ষতিপূরণের জন্য তারা পড়াশোনা, সাহিত্য সঙ্গীত, খেলাধূলা বা ব্যবসা বানিজ্যে অসম্ভব রকম দক্ষতার পরিচয় দিয়ে অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করে। আবার দেখা যায়, নিরক্ষর পিতা পুত্র বা কন্যাকে উচ্চশিক্ষিত করে নিজের নিরক্ষরতার ক্ষতিপূরণ বা অতিপূরণ করেন।

মনঃসৃষ্টি বা (Phantasy) সুস্থ ব্যক্তির ক্ষেত্রে আত্মরক্ষার কৌশল (ego-defence Mechanism) হিসাবে দেখা দিতে পারে। এ হল এক ধরনের উদ্ভট কল্পনা যার মধ্য দিয়ে নির্জ্ঞান উদ্দেশ্য সংজ্ঞা মনে প্রকাশিত হয়।

মনঃসৃষ্টির একটা স্তর পর্যন্ত ব্যক্তি তার কল্পিত বিষয়ের অবাস্তবতা সম্পর্কে মোটামুটিভাবে সচেতন থাকে। কিন্তু সে যখন তার নিজের ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষার ভিত্তিতে উৎপন্ন উদ্ভট কল্পনাকে বাস্তব সত্য বলেই মনে করে তখন তা গুরুতর মানসিক রোগের (চিত্তভ্রংশী বাতুলতা বা Schizophrenia) লক্ষণ হিসাবে বিবেচিত হয়।

ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্বে (Regression) বা প্রত্যাবৃত্তি হল এক ধরনের পশ্চাদগমন বা পশ্চাদপ সরণ। ব্যক্তির যৌনমানস শক্তি (Libido) -র আত্মপ্রকাশের ক্ষেত্রে অনেক সময় নানা কারণে বাধার সৃষ্টি হয়। এই বাধার জন্য লিবিডো যদি কোনো স্তরে অতৃপ্ত থেকে যায় অথবা ব্যক্তি যদি নিজেকে মানিয়ে নিতে না পারে তখন বয়সোপযোগী পর্যায় থেকে পূর্ববর্তী পর্যায়ে (সাধারণত শৈশবের যে পর্যায়ে সে আনন্দ পেয়েছিল) সে ফিরে পেতে চেষ্টা করে। তাই অনেক সময় আমরা বৃদ্ধ ব্যক্তিকে শিশু বা কিশোর-সুলভ আচার আচরণ করতে দেখি।

উভাবেগ ঃ ব্যক্তির দ্বৈত মানসিকতা বা উভাবেগ তার নিজস্ব এবং তার সঙ্গে বিভিন্ন সম্পর্কের সূত্রে আবদ্ধ স্বজন পরিজনদের জীবনে জটিল সমস্যা-সংকটের সৃষ্টি করে। Ambivalence বলতে বোঝানো হয়, দোদুল্যমানতা, দ্বিমুখিনতা, দোটানা। যুগপৎ

আকর্ষণ ও বিতৃষ্ণার মনোভাব। সুইস মনোবিজ্ঞানী ইউজেন ব্লয়েলার ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে স্কিজোফ্রেনিয়া রোগের ক্ষেত্রে এই কথাটি প্রয়োগ করেন। ফ্রয়েড মনঃসমীক্ষার ক্ষেত্রে Ambivalence বিষয়টিকে বিশেষ গুরুত্ব দিতেন। তাঁর মতে Ambivalence হল, "Ambivalence is the Contrasting pair of impalses developed in almost the same manner."[১১] অর্থাৎ একইভাবে বর্ধিত বিভিন্ন পরস্পর বিরোধী ভাব বা আবেগের যুগপৎ অবস্থানকে Ambivalence বলে। একই ব্যক্তির মনে একই সঙ্গে ভালবাসা-ঘৃণা, উৎসাহ-উদ্দীপনা, আকষর্ণ-বিতৃষ্ণা প্রভৃতি বিপরীতধর্মী মনোভাবের প্রকাশ ঘটলে তাকে আমরা বলবো উভাবেগ বা দ্বৈতমানসিকতা বা দোলাচলচিত্ততা। ব্যক্তির আচার আচরণের ঐ জাতীয় মনোভাবের প্রকাশ সাধারণ মানুষের কাছে রহস্যময় বলে মনে হয়। কিন্তু ব্যক্তির ঐ অসঙ্গতিপূর্ণ ব্যবহারের মূলে কাজ করে নিজ্ঞান মনের ক্রিয়া। বিভিন্ন আবেগ ও ইচ্ছার দ্বন্দ্বময় সংঘাতের ফলেই যে চারিত্রিক অসঙ্গতির সৃষ্টি হয়, তা মনস্তাত্ত্বিকেরা জানেন। তাই তাঁদের কাছে ব্যক্তির গহন মনের খবর জানার জন্য দোলাচলচিত্ততা বিষয়টি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

বহুবল্লভতার কামনাঃ ''নারী নাহি হতে চায় শুধু একা কারো,
এরা দেবী, এরা লোভী, যত পূজা পায় এরা চায় তত আরো;
ইহাদের অতিলোভী মন,
একজনে তৃপ্ত নয়, এক পেয়ে সুখী নয়,
যাচে বহুজন !''[১২]

— শুধু নারী নয়, প্রত্যেক পুরুষের প্রবৃত্তির মধ্যেও এই আদিম প্রবণতা রয়েছে। শিক্ষা-সংস্কার মানুষের ঐ প্রবৃত্তি প্রকাশের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। বহুবল্লভতার কামনায় এক ধরণের শিশুসুলভ স্বার্থপরতাবোধ কাজ করে। বহুবল্লভতার কামনা (Polymorphous Perverse) হল এক ধরনের বিকৃত মানসিক প্রবণতা। শৈশব থেকেই মানুষ যৌনমানসশক্তি দ্বারা পরিচালিত হয় — একথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। যখন কোনো বাইরের উদ্দীপক মানুষের প্রবৃত্তিকে উত্তেজিত করে তখন মানুষের প্রেম-প্রবৃত্তি বিকৃতি লাভ করে বহুবল্লভতার কামনায় রূপান্তরিত হয়। বহুবল্লভতার কামনা প্রসঙ্গে ফ্রয়েড বলেছেন—"...Under the influence of seduction, the child may become polymorphous perverse and may

be misled into all srots of transgressions. This goes to show that the child carries along the adaptation from them in his disposition. The formation of such perversions meets but slight resistance because the psychic dams against sexual trans-gressions, such as, shame, loathing, and morality—which depend on the age of the child — are not yet erected or are only in the process of formation. In this respect, the child perhaps does not behave differently from the average uncultured women in whom the same polymorphous perverse disposition exists." [১৩]

অবদমন ঃ দাম্পত্য সমস্যা সৃষ্টির মূলে অবদমিত কামনা বাসনা বা নির্জ্ঞান ইচ্ছা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ফ্রয়েডের মতে, ইদ্ বা অদসের সুখসূত্র (Pleasure principle) এবং অহম্ (ego)-এর বাস্তবতা সূত্র (reality)- এর দ্বন্দ্বই অবদমনের মূল কারণ। সমাজ অস্বীকৃত কামনা-বাসনা, আবেগ ইত্যাদি চেতন বা সংজ্ঞান (Conscious) মনের কাছে গ্রহণীয় না হলে, যে স্বতঃক্রিয় (automatic) প্রক্রিয়ায় তাদের নির্জ্ঞানের অন্ধকারে ঠেলে দেওয়া হয়, তাকেই অবদমন (repression) বলে— "আমাদেরই নিজেদেরই বাসনা-কামনা নিজেদেরই অজান্তে আমরা নির্জ্ঞান মনে নির্বাসিত করি। এই নির্বাসনের নামই অবদমন (repression)। অনেক সময় আমরা সজ্ঞান ভাবেই নিজেদের চাহিদা নির্জ্ঞান মনে পাঠিয়ে দিই। একে ফ্রয়েড নিরোধ বা Suppression বলেছেন।"[১৪]

হীনম্মন্যতা ঃ অস্ট্রিয়ার মনোরোগ চিকিৎসক আলফ্রেড অ্যাডলার (১৮৭০ - ১৯৩৭) ব্যক্তি অস্বাভাবিক আচরণ তথা মনোরোগের কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন যে, ব্যক্তির হীনম্মন্যতার অনুভূতির মধ্যে মনোব্যাধির কারণ নিহিত থাকে। হীনমন্যতা (Inferiority Complex) হল, নিজের সম্বন্ধে বাস্তব ভিত্তিক বা কাল্পনিক হীন ধারণা পোষণ এবং তার ফলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে হামবড়া ও আক্রমণাত্মক ভাব প্রদর্শন। অ্যাডলার এবং তাঁর অনুগামীরা মনঃসমীক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা ব্যক্তি-মনস্তত্ত্ব (Individual Psychology)- এর ক্ষেত্রে এই মতের প্রচলন করেন।

সুইস মনোবিজ্ঞানী ইয়ুং (1875 -1961) এর মতে শৈশবকালীন সংবন্ধন মানসিক রোগের অপরিহার্য কারণ নয়। ব্যক্তি যদি বর্তমান সমস্যার সমাধান বা বর্তমান কোনো পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিতে অসমর্থ হয়, তাহলে মানসিক রোগের সৃষ্টি হতে পারে, মানিয়ে নেবার অক্ষমতা যখন প্রবল হয়ে ওঠে, তখন ব্যক্তির লিবিডো তার শৈশব কালীন জীবনযাত্রা ও আচরণ ধারাতে প্রত্যাবর্তন করে। এর ফলে ব্যক্তির আচরণ অসঙ্গতিপূর্ণ হয়ে ওঠে।

মানুষের মন সত্যই জটিল ও রহস্যময়। সে নিজেও জানে না তার অসঙ্গতিপূর্ণ আচার-আচরণের কারণ। এ সম্বন্ধে ব্যক্তি সব সময় সচেতনও নয়। তাই সমাজ সংসারে নানারকম ঘটনার পাশাপাশি অনেক দুর্ঘটনাও ঘটে চলে। মানুষের অবদমিত কামনা-বাসনা ও তার নির্জ্ঞান প্রদেশের নিগূঢ় প্রবৃত্তি গুলিই তার আচার-আচরণকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। ব্যক্তি-মনের স্বরূপ উদঘাটনে তাই মনের অভ্যন্তর প্রদেশের চিন্তা-অনুভূতির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়।

<u>উৎসসূত্র</u>

১। সমাজ মনোবিজ্ঞান, জহিরুল হক, আলেয়া বুক ডিপো, ৩৮/ ২ক বাংলা বাজার, ঢাকা ১১০০, প্রথম প্রকাশ ১৯৭৮, পরিমার্জিত সপ্তম সমস্করণ, মে ২০০৭, প.৩৯।

২। মহাকবি কালিদাসের সমগ্র রচনাবলী, তৃতীয় খন্ড, বুক হাউস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৭৭, পৃ. ১৪৮।

৩। শ্রী মদ্ভগবদ্গীতা, অনুবাদিকা, গায়ত্রী বন্দ্যোপাধ্যায়, গীতা প্রেস, গোরক্ষপুর, ২৭৩০০৫, তেত্রিশতম পুনর্মুদ্রণ, ২০০৯, পৃ. ৫২।

৪। সিগমুন্ড ফ্রয়েড মণঃসমীক্ষণের রূপরেখা, পুষ্পা মিশ্র ও মাধবেন্দ্রনাথ মিত্র, নিউ সেন্ট্রাল বুক এজেন্সি (প্রা.) লিমিটেড, ৮ / ১ চিন্তামণি দাস লেন, কলকাতা -০৯, প্রথম প্রকাশ, এপ্রিল ১৯৯৪, পুণমুদ্রণ, সেপ্টেম্বর ২০০৭, পৃ. ৩৪-৩৫।

৫। স্বপ্ন, গিরীন্দ্রশেখর বসু, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ২৪৩/১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা-০৬, দ্বিতীয় সংস্করণ, ফাল্গুন ১৩৫১, পঞ্চম মুদ্রণ আষাঢ় ১৪১৩, পৃ. ৯।

৬। মনোবিদ্যা, সমরেন্দ্র ভট্টাচার্য, বুক সিন্ডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড, ৩৫ কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ, অক্টোবর, ১৯৯৬, পুনমুদ্রণ, আগষ্ট, ২০১১, পৃ. ৬।

৭। পাভলভ পরিচিতি, ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, পাভলভ ইনস্টিটিউট, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৬, পরিমার্জিত অখন্ড সংস্করণ, জানুয়ারী, ২০০০, পৃ. ২৩৬।

৮। সিগমুন্ড ফ্রয়েড মনঃসমীক্ষণের রূপরেখা, পুষ্পা মিশ্র ও মাধবেন্দ্রনাথ মিত্র, নিউ সেন্ট্রাল বুক এজেন্সি (প্রা.) লিমিটেড, ৮ / ১ চিন্তামণি দাস লেন, কলকাতা -০৯, প্রথম প্রকাশ, এপ্রিল ১৯৯৪, পুণমুদ্রণ, সেপ্টেম্বর ২০০৭, পৃ. ২২।

৯। মনোবিদ্যা, পরেশনাথ ভট্টাচার্য, এ মুখার্জ অ্যান্ড কোম্পানী প্রাইভেট লিঃ, ২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২, প্রথম সংস্করণ, আষাঢ়, ১৩৭০, পৃ. ২৭২।

১০। অস্বভাবী মনোবিদ্যা এবং মনোরোগবিদ্যার অভিধান, ধ্রুবজ্যোতি মজুমদার, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, প্রথম প্রকাশ, আগষ্ট ১৯৯১, পৃ. ২২৩।

১১। Introductory Lecture on Psycho-analysis, Sigmund Freud, Translated by John Riviere, George Allen & Unwin, London, First Ed. 1922, পৃ. ৩৪।

১২। পুষ্পা মিশ্র ও মাধবেন্দ্রনাথ মিত্র (নং-৮) পৃ. ২২।

১৩। সঞ্চিতা, নজরুল্ ইসলাম, ভি. এম. লাইব্রেরী, ৪২ বিধান সরণী, কলকাতা - ০৬, প্রথম প্রকাশ, আশ্বিন, ১৩৩৫, আটষট্টিতম সংস্করণ, আশ্বিন ১৪১৬, পৃ. ২৩।

১৪। An Introduction To Jungs Phychology, Fordham Friede, Published by Penguin, Harmonds worth, Middle Sex, (1956 ed.) পৃ. ২১।